ইউনিট ১

কালাম শাস্ত্র

ইলমুল কালাম বা কালাম শাস্ত্র হচ্ছে ইসলামী আকীদা বিশ্বাস সংক্রান্ত বিজ্ঞান। যে শাস্ত্রে ইসলামের মৌলিক আকীদা-বিশ্বাস সংক্রান্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে যুক্তি ও দর্শনভিত্তিক আলোচনা করা হয় তাকে কালাম শাস্ত্র বলা হয়। এ শাস্ত্রকে ইলমুল আকায়িদ ও ইলমুত তাওহীদও বলা হয়ে থাকে। কেননা এ শাস্ত্রের মূল আলোচ্য বিষয় হল, তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদ।

কালাম শাস্ত্রের মাধ্যমে ইসলামের মূল বিশ্বাস ও প্রত্যয়সমূহ সম্বন্ধে সুষ্ঠু, সঠিক ও সম্যক জ্ঞানার্জন করা যায়। এর মাধ্যমে ইসলাম বিরোধী মতবাদ ও বিরুদ্ধবাদীদের নানা প্রশ্ন, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও সংশয়ের সঠিক উত্তর প্রদানের যোগ্যতা অর্জন করা যায়। আল্লাহ তা'আলার যাত-সিফাত, একত্ববাদ, ফেরেশতা, আসমানী কিতাব, রিসালাত-নবুওয়াত, খাতামুন নবুওয়াত, তাক্‌দীর, আখিরাতের জীবন ও কিয়ামতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সম্বন্ধে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্বাস, যুক্তি-প্রমাণ ও দার্শনকি আলোচনার মাধ্যমে সঠিক জ্ঞান আহরণ ও তাতে বিশ্বাস স্থাপন কালাম শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় ও উদ্দেশ্য।

কালাম শাস্ত্রকে ইসলামের শ্রেষ্ঠতম শাস্ত্র বলা হয়। কারণ ইসলাম ও আকীদা যেমন ধর্মের মূলভিত্তি, তেমনি ঈমান-আকীদা সম্পর্কীয় শাস্ত্রও সমস্ত শাস্ত্রের মূলভিত্তি। তাই এটি সকল শাস্ত্রের উপরে মর্যাদার দাবি রাখে। ঈমান ও আকীদা সম্পর্কে যুক্তি প্রমাণ ও দর্শন ভিত্তিক সম্যক জ্ঞান লাভ করাই কালাম শাস্ত্র শিক্ষার মহান উদ্দেশ্য। ইসলামের প্রাথমিক যুগে এ শাস্ত্রের তেমন প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়নি। কিন্তু গ্রিক দর্শনের মাধ্যমে যখন ইসলামী আকীদার উপর নানাভাবে আক্রমণ আসতে থাকে এবং গ্রিক দর্শনে প্রভাবিত হয়ে মুসলিম মনীষীদের একটি অংশ ইসলামের আকীদা সংক্রান্ত বিষয়গুলোকে ভ্রান্ত যুক্তি দ্বারা ত্রুটিপূর্ণভাবে প্রমাণ করতে আরম্ভ করে, তখন এ শাস্ত্রের উদ্ভব হয়।

এ ইউনিটের পাঠগুলো নিম্নরূপ

❖ পাঠ-১ : কালাম শাস্ত্রের পরিচয়

❖ পাঠ-২ : কালাম শাস্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

❖ পাঠ-৩ : আকায়িদ সম্পর্কিত মতবাদ : জাবারিয়া, কাদারিয়া, মুতাযিলা, ও আশআরিয়া

❖ পাঠ-৪ : আকায়িদ সম্পর্কিত মতবাদ : খারিজী, মুরজিয়া ও শিয়া মতবাদ

পাঠ-১

কালাম শাস্ত্রের পরিচয়

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- কালাম শাস্ত্রের আভিধানিক ও পারিভাষিক পরিচয় বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- কালাম শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় বলতে পারবেন;
- কালাম শাস্ত্রের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন;
- কালাম শাস্ত্রের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন;
- কালাম শাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবেন।

ইলমুল কালাম-এর পরিচয়

ইলম (علم) শব্দের অর্থ জ্ঞান, বিদ্যা, বিজ্ঞান, শাস্ত্র। আর কালাম (الكلام) অর্থ হচ্ছে, বাক্য, বাণী, উক্তি, কথা, অর্থবোধক ধ্বনি, Sentence Speach, Message, Word & Dialouge ইত্যাদি। ইলমুল কালাম-এর পরিচয় ব্যক্ত করে মনীষীগণ যে সব সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সংজ্ঞা এখানে উপস্থাপন করা হল-

- যে শাস্ত্র পাঠ করলে ইসলামের আকীদা ও বিশ্বাস সম্পর্কে সুষ্ঠু, সঠিক ও সম্যক জ্ঞান লাভ করা যায় এবং যুক্তি-প্রমাণের আলোকে ইসলাম বিরোধী মতবাদ ও বিরুদ্ধবাদীদের নানা প্রশ্ন, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও সংশয়ের উত্তর প্রদানের যোগ্যতা অর্জন করা যায় তাকে 'ইলমুল কালাম' বলে।

যে শাস্ত্র পাঠ করলে ইসলামের আকীদা ও বিশ্বাস সম্পর্কে সুষ্ঠু, সঠিক ও সম্যক জ্ঞান লাভ করা যায় এবং যুক্তি-প্রমাণের আলোকে ইসলাম বিরোধী মতবাদ ও বিরুদ্ধবাদীদের নানা প্রশ্ন, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও সংশয়ের উত্তর প্রদানের যোগ্যতা অর্জন করা যায় তাকে ইলমুল কালাম বলে।

- আল্লামা মুহাম্মদ আলী (র) ইলমুল কালামের পরিচয় দিয়ে বলেন, ইলমুল কালাম হল এমন বিদ্যার নাম যার মাধ্যমে ব্যক্তি দলীল-আদিল্লাহ বা যুক্তি-প্রমাণের দ্বারা ইসলামী আকীদা ও বিশ্বাসগুলোকে প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত করতে পারে এবং এ সংক্রান্ত যাবতীয় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, সন্দেহ-সংশয় দূরীভূত করে সঠিক ঈমান গ্রহণ করতে সক্ষম হয়।

মোটকথা ইলমে কালাম হল এমন শাস্ত্র, যা ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস সংক্রান্ত বিষয়গুলো প্রামাণ্যভাবে আলোচনা করে ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসের আলোচিত বিষয় সম্পর্কে যাবতীয় সন্দেহ, সংশয় এবং বিভিন্ন জটিল প্রশ্নের উত্তর প্রদানে কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

উল্লেখ্য যে, ইলমুল কালাম বা কালাম শাস্ত্রকে ইলমুত তাওহীদ (علم التوحيد) এবং ইলমুল আকায়িদ (علم العقائد) ও বলা হয়। এ শাস্ত্রকে ইলমুল কালাম বলার কারণ হল, আল্লাহর কালাম বা বাণীকে কেন্দ্র করেই এ শাস্ত্রের উদ্ভব অথবা আল্লাহর কালামই এর মূল বিষয়বস্তু। আর এ বিদ্যায় প্রধানত ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস ও ঈমান সম্পর্কিত বিষয়াবলী নিয়ে আলোচনা করা হয়, তাই একে ইলমুল আকায়িদও বলে। অন্যদিকে এ শাস্ত্রের মূল উদ্দেশ্য ও আলোচ্য বিষয় আল্লাহর একত্ববাদ এবং একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা। তাই এটিকে ইলমুত তাওহীদও বলা হয়।

প্রকারভেদ

কালাম শাস্ত্রবিদগণ ইলমুল কালাম-কে দুই ভাগে ভাগ করে থাকেন। যথা-

১. كلام القدماء (المتقدمين) বা প্রাচীনদের কালাম শাস্ত্র

২. كلام المتأخرين বা উত্তরসূরীদের কালাম শাস্ত্র।

কালামুল কুদামা বা প্রাচীনদের কালামশাস্ত্র

কালামুল কুদামা বা প্রাচীনদের কালাম শাস্ত্র হচ্ছে, যে শাস্ত্রে দার্শনিক যুক্তি প্রমাণ ও প্রাজ্ঞতা ব্যতীত শুধু কুরআন-হাদীসের দলীলের আলোকে ধর্মীয় আকীদা, বিশ্বাসগুলো প্রমাণ করতে চেষ্টা করা হয়েছে। আর এ বিষয়ের উপর রচিত কয়েকটি গ্রন্থ হল-ইমাম আবু হানীফার 'আল ফিকগুল আকবার'; আল্লামা নাসাফী (র.)-এর 'বাহরুল কালাম' এবং 'কিতাবুত তামহীদ' ইত্যাদি।

অধিকাংশ আলিমের মতে-ইলমুল কালামের আলোচ্য বিষয় হল, ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসগুলোর আলোচনা, প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত যাবতীয় জ্ঞান।

কালামুল মুতাআখখিরীন বা উত্তরসূরীদের কালাম শাস্ত্র

কালামুল মুতাআখখিরীন বা উত্তরসূরীদের কালাম শাস্ত্র হচ্ছে, যে শাস্ত্রে ধর্মীয় আকীদা বিশ্বাসগুলো আলোচনার ও প্রমাণের ক্ষেত্রে কুরআন-হাদীসের দলীলের পাশাপাশি বুদ্ধিভিত্তিক প্রাজ্ঞতা ও দার্শনিক যুক্তি প্রমাণকেও স্থান দেওয়া হয়েছে। এ পর্যায়ের কয়েকটি গ্রন্থ হল : আল-মাওয়াফিক, শরগুল মাকাসিদ, আত-তাহযীব, ইমাম রাযীর কিতাব ইত্যাদি।

ইলমুল-কালামের আলোচ্য বিষয়

মাওয়াকিফ নামক গ্রন্থে আল্লামা কাজী ইযযুদ্দীন আবদুর রহমান 'ইলমে কালামের' আলোচ্য বিষয় বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনটি মত উল্লেখ করেন-

১. অধিকাংশ আলিমের মতে-'ইলমুল-কালামের আলোচ্য বিষয় হল, ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসগুলোর আলোচনা, প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত যাবতীয় জ্ঞান।

২. কাজী আরমুভী (র) বলেন, ইলমুল কালামের আলোচ্য বিষয় হল, আল্লাহ তা'আলার যাত বা সত্তা। যে কারণে এ শাস্ত্রে আল্লাহ তা'আলার সিফাত বা গুণাবলী, তাঁর পার্থিব কার্যাবলী, পারলৌকিক কার্যাদি যেমন-হাশর-নাশর, হিসাব-নিকাশ, জান্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদি এবং তাঁর গুকুম-আহকাম সম্পর্কেই আলোচনা করা হয়ে থাকে।

৩. ইমাম গাযালী (র) বলেন, 'সাধারণত অস্তিত্বশীল বস্তুই হল-এর আলোচ্য বিষয়। কারণ ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসের বর্ণনা, প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠা একমাত্র অস্তিত্বশীল বিষয়ের সাথেই সংশ্লিষ্ট।

আল্লাহ তা আলার একত্ববাদ, ফেরেশতা, আসমানী কিতাবসমূহ, রাসুলগণ, তাকদীরের ভালমন্দ ও কিয়ামতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আকাদী-বিশ্বাস ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করাই হল কালাম শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি যে, ইলমুল কালাম-এর আলোচ্য বিষয় প্রধানত তিন প্রকার। যথা-

প্রথমত : এর আলোচ্য বিষয় হল, আল্লাহর যাত বা সত্তা এবং সিফাত বা গুণাবলী সম্পর্কে আলোচনা করা। আল্লাহ তা'আলার তাওহীদ বা একত্ববাদের প্রমাণ এবং আল্লাহ তা'আলার সমস্ত ইতিবাচক ও নেতিবাচক গুণাবলী কালাম শাস্ত্রের প্রধান আলোচ্য বিষয়।

দ্বিতীয়ত: ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস যা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ঈমানের সাথে সম্পর্কিত, ইলমুল কালাম-এর আলোচ্য বিষয়।

তৃতীত: সাধারণত অস্তিত্বশীল বস্তু বা বিষয়-এর আলোচ্য বিষয়। কারণ ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসের বর্ণনা, প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠা কেবল অস্তিত্বশীল বিষয়ের সাথেই সংশ্লিষ্ট।

ইলমুল কালাম বা কালাম শাস্ত্রের উদ্দেশ্য-লক্ষ্য হল-বিশুদ্ধ আকীদা-বিশ্বাসের উপর যথাযথ জ্ঞান অর্জন করা এবং বাতিল-ভ্রান্ত আকীদা বিশ্বাস হতে মুক্তি লাভ করার সাথে সাথে বাতিল ও ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাসের অসরাতা প্রতিপন্ন করা, বিরুদ্ধবাদীদের অপযুক্তি খণ্ডনের শক্তি ও যোগ্যতা অর্জন করা।

ইলমুল কালাম এর উদ্দেশ্য-লক্ষ্য

'ইলমুল কালাম' বা কালাম শাস্ত্রের উদ্দেশ্য-লক্ষ্য হল, বিশুদ্ধ আকীদা-বিশ্বাসের উপর যথাযথ জ্ঞান অর্জন করা এবং বাতিল ও ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস হতে মুক্তি লাভ করা। সাথে সাথে বাতিল ও ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাসের অসারতা প্রতিপন্ন করা, বিরুদ্ধবাদীদের অপযুক্তি খণ্ডনের শক্তি ও যোগ্যতা অর্জন করা। এ উদ্দেশ্যসমূহকে চারটি পয়েন্টে উল্লেখ করা যায়।

ক. যারা ইসলামী আকীদায় বা মূল বিশ্বাসের প্রতি অনুসন্ধানী তাদের দীপ্তিমান দলীল-প্রমাণাদির সাহায্যে সঠিক পথ নির্দেশ করা। অপর পক্ষে যারা ইসলামী বিশ্বাসের বিরুদ্ধাচরণ করে তাদের যুক্তি-তর্ক ও প্রশ্নের দাঁতভাঙ্গা জাবাবের জন্য অকাট্য যুক্তি প্রমাণাদি উপস্থাপন করা।

খ. ভ্রান্ত ও বাতিলপন্থীরা ইসলামী বিশ্বাস ও বিধানসমূহের উপর অহেতুক সন্দেহবশত আক্রমণ করে, তাদের আক্রমণ প্রতিহত করে ইসলামী বিশ্বাস ও বিধানকে প্রতিষ্ঠা করা।

গ. মানুষ যাতে অন্ধভাবে কোন কিছু অনুকরণ না করে সে দিকে দৃষ্টি রেখে তাদেরকে দৃঢ় বিশ্বাসের উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত করা।

ঘ. সর্বোপরি ঈমান-আকীদা সম্বন্ধে বিজ্ঞান ও দর্শন ভিত্তিক সুষ্ঠু জ্ঞান লাভ করা।

এছাড়া আরও বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ ও বিচারে ইলমুল কালামের উদ্দেশ্য বিভিন্ন হয়ে থাকে। আল্লামা মুহাম্মদ আলী (র.) ইলমুল কালামের পাঁচটি উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন। যেমন-

১. ইলমুল কালামের উদ্দেশ্য হল, অন্ধ অনুসরণের নাগপাশ ছিন্ন করে দৃঢ় বিশ্বাসের উচ্চতম মার্গে উপনীত হওয়া।

২. ধর্মীয় আকীদা-বিশ্বাসের সঠিক পথ অন্বেষণকারীদেরকে স্পষ্ট দলীল-প্রমাণের মাধ্যমে সঠিক পথ প্রদর্শন এবং বিরুদ্ধবাদীদের দাঁতভাঙ্গা জবাবের জন্য অকাট্য দলীল প্রমাণ উপস্থাপন করা।

৩. বাতিলপন্থীদের সন্দেহ-সংশয়ের আক্রমণ থেকে ইসলামী মূলনীতি তথা আকীদা-বিশ্বাসগুলোকে রক্ষা কর।

৪. কর্মসমূহে নিয়াতের বিশুদ্ধতা সৃষ্টি করা এবং কর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট আহকামের বিশুদ্ধ বিশ্বাসের প্রত্যয় সৃষ্টি করা। কারণ এর ফলেই কর্ম গৃহীত বা কবুল হয়ে থাকে।'

বস্তুত ইলমুল কালামের উদ্দেশ্য-লক্ষ্য সম্পর্কিত আলিমদের সকল মতের সারকথা হল, ইহকাল ও পরকালের পরিপূর্ণ সফলতা অর্জন করাই হচ্ছে ইলমুল কালামের উদ্দেশ্য-লক্ষ্য।

৫. ইলমুল কালামের উপর ভিত্তি করে শরয়ী জ্ঞান-বিজ্ঞানের উদ্ভাবন করা। কারণ, ইলমুল কালামের মাধ্যমে যখন এক-একক, সর্বশক্তিমান, আদেশদাতা রাসুল-প্রেরক ও কিতাব অবতারক আল্লাহর অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে তখন ইলমে তাফসীর, ইলমে হাদীস, ইলমে ফিকহ সহ অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয় আবিষ্কৃত হবে।

বস্তুত, ইলমুল কালামের উদ্দেশ্য-লক্ষ্য সম্পর্কিত আলিমদের সকল মতের সারকথা হল, ইহকাল ও পরকালের পরিপূর্ণ সফলতা অর্জন করাই হচ্ছে ইলমুল কালামের উদ্দেশ্য-লক্ষ্য।

কালাম শাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা

কালাম শাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তার কথা বলতে গিয়ে আল্লামা নাসাফী উল্লেখ করেন, প্রাথমিক যুগের মুসলমানগণ তথা সাহাবায়ে কিরাম (রা.) ও তাবিঈগণ তাদের নিষ্কলুষ আকীদা-বিশ্বাস এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পবিত্র সান্নিধ্য লাভের বরকতে ও তাঁর যুগের সাথে নিকটবর্তী যুগ হওয়ার কারণে, তদুপরি সে যুগে ঘটনাবলীর স্বল্পতা ও পারস্পরিক মতভেদ একান্ত অল্প থাকার কারণে সর্বোপরি নির্ভরযোগ্য ও সর্বজনমান্য ব্যক্তিবর্গের শরণাপন্ন হওয়ার সুযোগ থাকার দরুণ তাঁরা ইলমে ফিকহ ও ইলমুল কালামের প্রতি আদৌ মুখাপেক্ষি ছিলেন না।

পরবর্তীকালে যখন মুসলমানদের মধ্যে নানাবিধ ফিতনা-ফ্যসাদ ও ভ্রান্ত মতবাদের অভ্যুদয় ঘটল, উলামায়ে দ্বীন ও মুসলিম মনীষীদের প্রতি অন্যায়-অত্যাচার শুরু হল, মানুষের মধ্যে মতের পার্থক্য দেখা দিতে শুরু করল, বিদ্‌আত ও মনগড়া চালচলনে আসক্তি দেখা দিতে লাগল, ফাতওয়া ও ঘটনাবলীর ফিরিস্তি ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে লাগল, জটিল বিষয়ে আলিমদের শরণাপন্ন হওয়ার প্রয়োজনীয়তা ঘটনাবলীর ফিরিস্তি ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে লাগল, জটিল বিষয়ে আলিমদের শরণাপন্ন হওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। তখনই শরয়ী মাসায়েল উদ্ভাবন ও তজ্জন্য নীতিমালা নির্ধারণ এবং বিশুদ্ধ আকীদাসমূহ দলীল-প্রমাণসহ সাব্যস্ত করা এবং বাতিল আকীদাগুলো খণ্ডন করার দলীল ও যুক্তি নির্ধারণের প্রয়োজন দেখা দেয়। এভাবে মুসলমনাদের ধর্মীয় আকীদা-বিশ্বাসকে ত্রুটি মুক্ত রাখার তাগিদে এবং ভ্রান্ত মতবাদীদের প্রত্যুত্তর দেওয়ার প্রয়োজনে মুসলিম সমাজে ইলমুল কালাম বা কালাম শাস্ত্রের চর্চার আবশ্যকতা সৃষ্টি হয়েছে। (-আকাঈদে নাসাফী)

সারসংক্ষেপ

'ইলম' অর্থ জ্ঞান-বিজ্ঞান, বিদ্যা, শাস্ত্র, আর 'কালাম' শব্দের অর্থ কথন, উক্তি, বাক্য। ইসলামের পরিভাষায় যে শাস্ত্র বা বিষয় পাঠ করলে যুক্তি প্রমাণের মাধ্যমে ইসলামী আকীদা ও বিশ্বাসসমূহ সম্পর্কে সুষ্ঠু, সঠিক ও সম্যক-জ্ঞান অর্জন করা যায় এবং ইসলাম বিরোধী মতবাদ ও বিরুদ্ধবাদীদের নানা প্রশ্ন, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, সন্দেহ-সংশয় ও যুক্তি-তর্কের সঠিক ও বুদ্ধিভিত্তিক উত্তর প্রদানের যোগ্যতা অর্জন করা যায় তাকে ইলমুল কালাম বা কালাম শাস্ত্র বলা হয়। এ শাস্ত্রকে ইলমুল আকায়িদ এবং ইলমুত তাওহীদও বলা হয়। কারণ এ শাস্ত্রেই আল্লাহর সত্তা, গুণাবলী ও একত্ববাদ এবং ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস ও আকীদাসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। মূলত, এর আলোচ্য বিষয় হচ্ছে, আল্লাহ, আল্লাহর একত্ববাদ, রিসালাত, ফেরেশতা, আসমানী কিতাব, তাকদীর, আখিরাতের জীবন, ও কিয়ামত সম্পর্কিত বিষয়াবলী সম্পর্কে সম্যক যুক্তি ও দর্শন ভিত্তিক জ্ঞান আহরণ। এরই মাধ্যমে ঈমানকে পরিশুদ্ধ ও দৃঢ় মূলে প্রতিষ্ঠা করা ও অবিচল থাকা যায়। কাজেই, কালাম শাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সকল শাস্ত্রের চেয়ে বেশি এবং শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার।

নোট করুন

❑ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

➤ নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

▶ সঠিক উত্তরে টিক (√) চিহ্ন দিন-

১. 'ইলম' শব্দের অর্থ-
   ক. জ্ঞান, বিদ্যা, বিজ্ঞান, শাস্ত্র;
   খ. বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান, গরিমা;
   গ. বাণী, জ্ঞান, বুদ্ধি, উক্তি;
   ঘ. বাক্য, জ্ঞান, বিজ্ঞান, শাস্ত্র।

২. ইলমুল কালাম অর্থ-
   ক. ফিকহ শাস্ত্র;
   খ. কালাম শাস্ত্র;
   গ. তর্ক শাস্ত্র;
   ঘ. ধর্মতত্ত্ব শাস্ত্র।

৩. ইলমুল কালামকে আরও বলা হয়-
   ক. ইলমুত তাওহীদ ও ইলমুল আকায়িদ;
   খ. ইলমুত তাওহীদ ও ইলমুল ফিকহ;
   গ. ইলমুল ফিকহ ও ইলমুত তাজবীদ;
   ঘ. ইলমুল ফিকহ ও মাওয়াকিফ।

৪. কালাম শাস্ত্রের মূল উদ্দেশ্য ও আলোচ্য বিষয় হচ্ছে-
   ক. কালাম শাস্ত্র;
   খ. ফিকহ শাস্ত্র;
   গ. আল্লাহর একত্ববাদ;
   ঘ. আল্লাহর বিধানাবলী।

৫. ইলমুল কালাম-এর আলোচ্য বিষয় প্রধানত ক'টি?
   ক. ৫টি;
   খ. ৬টি;
   গ. ৩টি;
   ঘ. ১টি।

৬. কালাম শাস্ত্রের উদ্দেশ্য-লক্ষ্য হল-
   ক. কালাম শাস্ত্র সম্পর্কিত জ্ঞান লাভ;
   খ. কালাম ও ফিকহ সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন;
   গ. আল্লাহর বিধান ও একত্ববাদ সম্পর্কিত জ্ঞান লাভ;
   ঘ. ইহকাল ও পরকালের পরিপূর্ণ সফলতা অর্জন করা।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. ইলমুল কালাম-এর পরিচয় দিন।
২. কালাম শাস্ত্রবিদগণ ইলমুল কালাম-কে কয়ভাগে বিভক্ত করেন এবং সেগুলো কী কী? লিখুন।
৩. ইলমুল কালাম এর আলোচ্য বিষয় আলোচনা করুন।
৪. ইলমুল-কালাম -এর উদ্দেশ্য-লক্ষ্য বিশ্লেষণ করুন।
৫. কালাম শাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে আল্লামা নাসাফীর বক্তব্য তুলে ধরুন।

❑ বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. কালাম শাস্ত্র বলতে কী বুঝায়? কালাম শাস্ত্রের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করুন।

পাঠ-২

কালাম শাস্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- ইলমুল কালামের উৎপত্তির কারণ বর্ণনা করতে পারবেন;
- 'ইলমুল কালাম' নামকরণের কারণ বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- কালাম শাস্ত্রের ক্রমবিকাশের ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবেন।

কালাম শাস্ত্রের উৎপত্তি

ইসলামের প্রথম যুগের মুসলমানগণ কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত ইসলামের আকীদা সংক্রান্ত বিষয়গুলো মেনে নিয়েছিলেন। তাই তারা কুরআন ও হাদীস ব্যতীত অন্য কোন জ্ঞান চর্চার প্রতি দৃষ্টিপাত করেননি। কারণ এ ব্যাপারে তাদের ঈমান ছিল সহজ ও সরল অথচ খুবই দৃঢ় ও মজবুত। তাদের ঈমান ও বিশ্বাসের ব্যাপারে কোন জটিলতা ছিল না। হযরত মুহম্মদ (স.)-এর জীবিত থাকাকালে যখন সাহাবীগণ কোন সমস্যার সম্মুখীন হতেন, তখন তারা উক্ত সমস্যা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নিকট পেশ করতেন। তিনি অত্যন্ত সহজভাবে এর সামধান করে দিতেন। ফলে ঈমান ও আকীদার ব্যাপারে দার্শনিক ব্যাখ্যা এবং যুক্তিতর্কের কোন প্রয়োজনই হত না। অতএব বলা যায় যে, ইসলাম আরব ভূ-খণ্ডে সীমাবদ্ধ থাকাকালীন অবস্থায় ইলমুল কালামের উৎপত্তি হয়নি।

পরবর্তীকালে ইসলামের ব্যাপক বিজয় সংঘটিত হয়। ফলে ইসলাম আরবের বাইরে প্রসার লাভ করে। এতে মুসলমানগণ অনারব বিভিন্ন জাতির চিন্তাধারা, ধর্মীয় বিশ্বাস, শিক্ষা-সংস্কৃতি এবং দার্শনিক মতাদর্শের সংস্পর্শে আসে। আরব-অনারব উভয়ের মধ্যে পরস্পর ভাবের আদান-প্রদান হতে থাকে। ফলে ইয়াহূদী, খ্রিস্টান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীগণ ইসলামী বিশ্বাস ও চিন্তাধারা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে তাদের চিন্তাধারা ও সাংস্কৃতিক ছাঁচে উক্ত ইসলামী বিশ্বাস ও চিন্তাধারাকে তুলনা করতে থাকে। তদুপরি অবান্তর যুক্তি-প্রমাণের সাহায্যে ইসলামী বিশ্বাস ও চিন্তাধারার মধ্যে দ্বিধা ও সন্দেহের বীজ বপন করার চেষ্টা করে। তারা দর্শনের অন্তরালে থেকে নানা প্রকার তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে ইসলামী আকীদার উপর নানা প্রকার প্রশ্ন উত্থাপন করে সন্দেহ সৃষ্টি করার চেষ্টা চালায়। আব্বাসীয় যুগে অবাধ ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং মুক্তবুদ্ধির চর্চার ফলে তাদের সুযোগ আরও বেড়ে যায়।

মুসলমানদেরকে সঠিক ইসলামী আকীদার উপর টিকিয়ে রাখার জন্য আকীদায় দ্বিধা ও সন্দেহ পোষণ হতে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে এবং ইসলাম বিরোধী যুক্তি-তর্ক সম্বলিত প্রশ্নাবলীর যথাযথভাবে জবাব দেওয়ার জন্য ইলমুল কালামের উদ্ভব হয়।

আব্বাসীয় যুগে খলীফা মনসুরের রাজত্বকালে জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণাগার স্থাপিত হয়। জ্ঞান-বিজ্ঞান সংক্রান্ত বিভিন্ন পুস্তক বিশেষ করে পারস্য ও গ্রীক দর্শনের পুস্তকসমূহ আরবিতে অনুবাদ করা হয়। ভারতীয় সংস্কৃতি ও চিন্তাধারা বিষয়ক পুস্তকগুলো সংস্কৃত ভাষা হতে আরবি ভাষায় অনুবাদ করা হয়। ফলে মুসলমানগণ এ সমস্ত বিজাতীয় দর্শন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে যুক্তি-তর্কের সংস্পর্শে আসে এবং ইসলামী বিশ্বাস ও চিন্তাধারা সম্পর্কে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এমনকি তাদের একদল লোক জীবনের সমস্ত কার্যকলাপকে দার্শনিক যুক্তি-প্রমাণের মাপকাঠিতে বিচার-বিশ্লেষণ করতে শুরু করে। ইসলামী বিশ্বাস ও চিন্তাধারায় নানা রকম জটিল প্রশ্নের উদ্ভব হয়। এতে মুতাযিলা, কাররামিয়া ও জাহমিয়া নামে বণ্ড ভ্রান্ত মতবাদপুষ্ট দলের সৃষ্টি হয়। তাই মুসলমানদেরকে সঠিক ইসলামী আকীদার উপর টিকিয়ে রাখার জন্য আকীদায় দ্বিধা ও সন্দেহ পোষণ হতে মুক্ত করার উদ্দেশ্য এবং ইসলাম বিরোধী যুক্তি-তর্ক সম্বলিত প্রশ্নাবলী দাঁতভাঙ্গা জবাব দেওয়ার জন্য ইলমুল কালামের সৃষ্টি হয়।

মুসলমানগণ অক্লান্ত পরিশ্রম ও অবর্ণনীয় সাধনার মাধ্যমে পাশ্চাত্য দর্শন শিক্ষা লাভ করেন। এরপর কুরআন ও হাদীসের উপর ভিত্তি করে দার্শনিক যুক্তি তর্কের মাধ্যমে ইসলামী বিশ্বাস ও চিন্তাধারাকে মজবুতভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। যে সকল মনীষী এ মহান কাজে ব্রতী ছিলেন তাদের মধ্যে আবু মুসলিম, আবুল কাসেম বলখী ও আবু বকর সমধিক প্রসিদ্ধ। অবশ্য কখনও এ বিদ্যার তেমন কোন

ব্যাপকতা ও জনপ্রিয়তা গড়ে উঠেনি। অতঃপর আব্বাসীয় খলীফা আল-মাহদীর আমলে ইলমুল কালামের ক্রমবিকাশ ঘটে। খলীফা আল-মাহদী ইসলামী বিশ্বাসসমূহকে দার্শনিক বিচার-বিবেচনা ও যুক্তি-তর্কের ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্য সমসাময়িক আলেম সম্প্রদায়কে বই-পুস্তকাদি রচনা করার জন্য আহবান জানালেন। তাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে যুক্তি প্রমাণের সাহায্যে ইসলামদ্রোহীদের অবান্তর প্রশ্নাবলীর দাঁতভাঙ্গা জবাব দেন এবং ইসলামী আকীদা ও বিশ্বাস সংক্রান্ত বিষয়াদি সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। অবশেষে ইমাম গাযালী, ইমাম ফখরুদ্দন রাযী, ইমাম আশআরী, ইমাম মাতুরিদী প্রমুখ মনীষীগণ এ বিদ্যার পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তাঁরা দর্শন, বিজ্ঞানভিত্তিক ও বিবেকসম্মত যুক্তি-প্রমাণাদি দ্বারা ইসলামী বিশ্বাসসমূহকে যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁরা বগুসংখ্যক বিজ্ঞানসম্মত দর্শনভিত্তিক পুস্তক রচনা করে ইলমুল কালামের জনপ্রিয়তা গড়ে তোলেন। তাঁরা ইলমুল কালামকে একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসেবে রূপদান করে মুসলমানদেরকে সঠিক পথের নির্দেশ দেন। ফলে ইলমুল কালাম অত্যন্ত সমাদৃত হয় এবং প্রসার লাভ করে। এ ভাবেই ইলমুল কালামের উৎপত্তি এবং আস্তে আস্তে ক্রমবিকাশ ঘটে।

খলিফা আল-মাহদী ইসলামী বিশ্বাসসমূহকে দার্শনিক বিচার-বিবেচনা ও যুক্তি-তর্কের ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে সমসাময়িক আলেম সম্প্রদায়কে আহবান জানালেন। তাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে ইসলামী আকীদা ও বিশ্বাস সংক্রান্ত বিষয়াদি সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

ইলমুল কালাম-এর নামকরণের তাৎপর্য

ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস সম্পর্কিত বিদ্যাকে ইলমুল কালাম বা 'কালাম শাস্ত্র' হিসেবে নামকরণের কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে আল্লামা নাসাফী নিম্নোক্ত অভিমত উল্লেখ করেছেন-

১. ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলিম দার্শনিক ও বিরোধী শক্তির মধ্যে আকীদা সংক্রান্ত কোন বিষয়ে যখন মুনাজারা বা বাক-বিতণ্ডা হত, তখন আলোচনার শিরোনামে الكلام فى كذا وكذا (এ বিষয়ে অথবা ঐ বিষয়ে আলোচনা) ইত্যাদি লেখা হত। মুসলিম দার্শনিকদের আলোচনার শিরোনামে লিখিত الكلام শব্দ থেকে 'কালাম' শাস্ত্রের নামকরণ হয়েছে বলে ধারণা করা হয়।

২. আব্বাসীয় আমলে আল-কুরআন 'কাদীম ও হাদিস' অর্থাৎ চিরন্তন ও নশ্বর সংক্রান্ত মাসআলাটি এতই জটিল রূপ লাভ করে যে, এবিষয়কে কেন্দ্র শক্তিশালী বাতিল মহল আহলে হকের অসংখ্য লোককে নির্বিচারে হত্যা করে। ইলমুল কালাম বা কালাম শাস্ত্রে আল্লাহর কালাম তথা আল-কুরআন সংক্রান্ত মাসআলাটি সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও সবচেয় বেশি বাক-বিতণ্ডার মাসয়ালা হিসেবে গণনা করা হয়। তাই এ শাস্ত্রকে ইলমুল কালাম নামে অভিহিত করা হয়।

৩. 'ইলমুল মানতিক' (তর্ক বিদ্যা) অধ্যয়ন যেরূপ দার্শনিক ও যুক্তি তর্কভিত্তিক আলোচনায় শক্তি সামার্থ্যের যোগান দেয়, তেমনি ইলমুল কালাম ও শরয়ী মাসআলাগুলোর বিচার-বিশ্লেষণ এবং আলোচনায় শক্তি-সামর্থ্যের যোগান দেয়। কাজেই এ শাস্ত্রকে ইলমুল কালাম বলে।

৪. বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর সর্বপ্রথম যে বিদ্যা শিক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন তা হল আকায়িদ সম্পর্কিত শিক্ষা। এ শিক্ষা অর্জন করা, শিক্ষা প্রদান করা যেহেতু কালামের (কথা) সাহায্যে হয়ে থাকে, তাই এ বিদ্যাকে 'আল-কালাম' হিসেবে নামকরণ করা হয়।

৫. আকায়িদ সম্পর্কিত জ্ঞানার্জন করতে হলে কালাম বা পারস্পরিক আলোচনা ও বাক্য বিনিময় করার প্রয়োজন হয়। মূলত কালাম বা বাক্য বিনিময় অর্থাৎ আলোচনা ও বিতর্ক ব্যতীত আকায়িদ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায় না। কিন্তু অন্যান্য বিদ্যা অধ্যয়ন ও চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমেও জানা যায়। ফলে একে 'ইলমুল কালাম' হিসেবে নামকরণ করা হয়।

৬. 'কালাম' শব্দের অর্থ-বাক্য, আকায়িদ সম্পর্কিত বিষয়ে বিরুদ্ধবাদীদের দ্বিধা-সংশয়, যুক্তি-প্রমাণ খণ্ডন করার জন্য খুব বেশি যুক্তিপূর্ণ কালাম বা বাক্য বিনিময়ের দরকার হয়। এ যুক্তি কালাম বা বাক্য প্রয়োগের কারণে এ শাস্ত্রের নাম 'ইলমুল কালাম' রাখা হয়েছে।

৭. দু'টি কথার মধ্যে যে কথাটি অধিক শক্তিশালী ও যুক্তি প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, আরবি ভাষায় তাকে বলা হয় هذا هو الكلام বা এটাই একমাত্র কথা। ইলমুল কালামের আলোচনা অন্যান্য বিদ্যার তুলনায় অত্যধিক শক্তিশালী যুক্তি-প্রমাণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। কাজেই এ শাস্ত্রকে ইলমুল কালাম বা কথার মত কথা বিদ্যা বলা হয়।

৮. ইলমুল কালাম -এর সম্পূর্ণ আলোচনা অকাট্য যুক্তি-প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত, যার অধিকাংশই কুরআন, হাদীস ও ইজমা থেকে নেওয়া। যার ফলে 'ইলমুল কালাম' হিসেবে নামকরণ করা

হয়েছে। কারণ الكلام শব্দটির অর্থ-আঘাত করা যা সাধারণত অন্তরের উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

ঐতিহাসিক ইবনে খাল্লিকানের (র.) মতে, আল্লাহর কালাম সম্পর্কে যেহেতু সর্বপ্রথম বিভ্রান্তির সৃষ্টি করা হয় আর কালাম শাস্ত্রের মাধ্যমেই এ বিভ্রান্তি দূরীভূত হয়, তাই ইসলামী আকীদার পরিবেশক হিসেবে এ শাস্ত্রকে 'ইলমুল কালাম' বলা হয়।

আল্লামা মুহাম্মদ আলী (র.) বলেন, 'আল-কালাম' তথা কালামুল্লাহ বা আল-কুরআন নশ্বর না কি অবিনশ্বর, কাদীম না কি হাদিস -এ মাসআলাই হল 'ইলমুল কালামের' প্রথম মাসয়ালা এবং এ মাসআলাকে কেন্দ্র করেই এ শাস্ত্রের উৎপত্তি , তাই এ শাস্ত্রকে 'ইলমুল কালাম' হিসেবে নাম রাখা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, পণ্ডিতগণ দার্শনিক আলোচনার সাহায্য-সহযোগিতার্থে একটি শাস্ত্রের আবিষ্কার করেন এবং ইলমুল মানতিক হিসেবে তার নামকরণ করেন। পক্ষান্তরে মুসিলম পণ্ডিতগণ ও ইসলামী আকায়িদের আলোচনার সুবিধার্থে অন্য একটি বিদ্যার আবিষ্কার করেন এবং ইলমুল কালাম হিসেবে তার নামকরণ করেন, যাতে উদ্দেশ্য ও নামকরণের দিক থেকে দু'টি শাস্ত্রই স্বতন্ত্র ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

সারসংক্ষেপ

ইসলামের প্রথম যুগের মুসলমানগণ আল্লাহর রাসুল (স.), সাহাবায়ে কিরাম ও তাবিঈগণের কাছ থেকে ইসলামের মুল আকীদা-বিশ্বাস সরলভাবে শিক্ষা করেছেন। পরবর্তীকালে ইসলামের ব্যাপক প্রসারতার ফলে মুসলমানগণ বিজাতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসে। তাছাড়া রাজনৈতিক নানাবিধ কারণে মুসলানদের মধ্যে নানা রকম ফিৎনা-ফাসাদ ও ভ্রান্ত মতবাদের সৃষ্টি হয়। ফলে ইসলামের আকীদা-বিশ্বাসের মধ্যে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করার কূট-কৌশল চলে।

আর সে সব সন্দেহ-সংশয়, মিথ্যাবাদ ও ভ্রান্ত ধারণা দূর করার জন্য ইলমুল কালাম-এর উদ্ভব হয়। বিশেষত গ্রিক দর্শনের মোকাবেলায় ইসলামী দর্শনের যৌক্তিকতা ও যথার্থতা তুলে ধরার জন্য ১৫৮ হিজরীতে আব্বাসীয় খলিফা আল-মাহদী ইলমুল কালাম চর্চার জন্য উৎসাহিত করেন। পরবর্তী খলীফা মামুনুর রশীদ ও খলিফা ওয়াসেক বিল্লাহ ও বার্মাকী মন্ত্রীদের স্বতঃস্ফূর্ত সাহায্য-সহযোগিতায় 'ইলমুল কালাম'-কে একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র বা বিজ্ঞান হিসেবে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু মুহাদ্দিস ও কট্টরপন্থীদের বিরোধিতায় তা পূর্ণাঙ্গ শাস্ত্র হিসেবে পরিচিত হতে পারেনি। পরবর্তীকালে ইমাম গাযালী, ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী, ইমাম আশআরী, ইমাম মাতুরিদী প্রমুখ মনীষীগণের প্রচেষ্টায় 'ইলমুল কালাম' একটি পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান-শাস্ত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ও বিকশিত হয়।

❑ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

➤ নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

► সঠিক উত্তরে টিক (√) চিহ্ন দিন-

১. ইসলামের প্রথম যুগের মুসলমানগণ একান্তভাবে কিসের উপর আমল করতেন?
   ক. কুরআন ও হাদীসের উপর; খ. রাসূলের কথার উপর;
   গ. সাহাবীগণের আমলের উপর; ঘ. ইজমা ও কিয়াসের উপর।

২. হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর জীবদ্দশায় কিসের বেশি প্রয়োজন হত না?
   ক. কুরআন ও হাদীসের; খ. দার্শনিক ব্যাখ্যা ও যুক্তি-তর্কের;
   গ. সাহাবীদের কথার; ঘ. ইলমুল কালামের।

৩. ইসলামের বিশ্বাসের মধ্যে কারা সংশয় সন্দেহের সৃষ্টি করার অপচেষ্টা চালায়-
   ক. ইয়াহূদী-খ্রিষ্টান ও অন্য ধর্মাবলম্বীগণ; খ. গ্রীক দার্শনিকগণ;
   গ. মুতাযিলা ও খারিজীগণ; ঘ. আরব পণ্ডিতগণ।

৪. কোন সময়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণাগার স্থাপিত হয়?
   ক. রাসুলের যুগে; খ. সাহাবীদের যুগে;
   গ. উমাইয়া রাজত্বকালে; ঘ. আব্বাসীয়া খলীফা মানসুরের রাজত্বকালে।

৫. কোন খলীফার আমলে ইলমুল কালাম প্রতিষ্ঠা লাভ করে?
   ক. খলীফা উমর (রা.); খ. খলীফা মনসুর;
   গ. খলীফা হারুন অর রশিদ; ঘ. খলীফা আল-মাহদী।

৬. ইলমুল কালামকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দান করেন কোন মনীষীগণ?
   ক. ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফেঈ, ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ;
   খ. ইমাম গাযালী, ফখরুদ্দীন রাযী, আশয়ারী, মাতুরিদী;
   গ. ইমাম আওযায়ী, ইমাম সারাখসী, ইমাম হাসান;
   ঘ. ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিযী।

৭. মুসলিম দার্শনিকদের আলোচনার কোন শিরোনাম থেকে 'কালাম' শাস্ত্রের নামকরণ হয়?
   ক. কালাম শব্দ থেকে; খ. মানতিক শব্দ থেকে;
   গ. নাণ্ড শব্দ থেকে; ঘ. তাসাউফ শব্দ থেকে।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. ইলমুল কালাম-এর উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি টীকা লিখুন।
২. ইলমুল কালাম-এর নামকরণের কারণ হিসেবে তিনটি যুক্তিযুক্ত কারণ বিশ্লেষণ করুন।
৩. ইলমুল কালাম বা কালাম শাস্ত্রের কয়েকজন মনীষীর নাম লিখুন ও তাঁদের পরিচয় দিন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. ইলমুল কালামের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করুন।
২. ইলমুল কালামের নামকরণের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করুন।

পাঠ-৩

আকায়িদ সম্পর্কিত মতবাদ : জাবারিয়া, কাদারিয়া, মুতাযিলা ও আশআরিয়া

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- কোন কোন মৌলিক আকীদা সম্পর্কিত বিষয়ে মুসলমানগণের মধ্যে মতভেদের সৃষ্টি হয়েছে, তা বলতে পারবেন;
- জাবারিয়া মতবাদ বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- কাদারিয়া মতবাদের বিষয়বস্তু বর্ণনা করতে পারবেন;
- মুতাযিলা মতবাদের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- আশআরিয়া মতবাদ সম্পর্কে জানতে পারবেন।

আকাইদ সংক্রান্ত মতভেদের ক্ষেত্রসমূহ

ইসলামের প্রাথমিক যুগে মানুষ ছিল যেমনি সহজ, সরল, তেমিন মানুষের ঈমান-আকীদাও ছিল সহজ। কারণ রাসুল্লাহ (স.)-এর জীবদ্দশায় তিনি যা কিছু করেছিলেন মুসলমানগণ তা যথাযথভাবে অক্ষরে অক্ষরে পালন করার চেষ্টা করতেন। পরবর্তী সময়ে ইসলাম যখন সারা বিশ্বে সম্প্রসারিত হতে আরম্ভ করে, তখন নও মুসলিমগণ তাদের পূর্ববর্তী ধর্মমত, আকীদা-বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী ইসলামী বিশ্বাস সংক্রান্ত বিষয়গুলোকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা আরম্ভ করে। ফলে পরবর্তিতে মুসলমানদের ঈমান-আকীদার বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাপারে মতবিরোধ দেখা দেয়। বিভিন্ন দল-উপদলের সৃষ্টি হয়। মুসলমানগণ যে সমস্ত বিষয়ে মতবিরোধের ফলে দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে পড়েছিলেন, সে সম্পর্কে প্রখ্যাত কালামশাস্ত্রবিদ আব্দুল করীম শাহরাসতানী 'কিতাবুল মিলাল ওয়ান-নিহাল' গ্রন্থে চারটি বিষয়ের উল্লেখ করেন, তা হল-

প্রথমত : কর্ম ও ইচ্ছায় মানুষের স্বাধীনতা আছে কিনা?
দ্বিতীয়ত : আল্লাহর সিফাত বা গুণাবলী আছে কিনা?
তৃতীয়ত : ঈমান ও আমলের মাঝে সম্পর্ক কী?
চতুর্থ : ন্যায় ও অন্যায়ের মাপকাঠি নিরূপণে ওহী এবং বুদ্ধি এ দু'য়ের মাঝে কোনটির প্রাধান্য বেশি?

আরও একটি বিষয় হচ্ছে কুরআনের চিরন্তনতা। মূলত এ পাঁচটি বিষয়কে কেন্দ্র করেই মুসলামনদের মধ্যে দল ও মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে। এসব মতবাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে-

ক) জাবারিয়া
খ) কাদারিয়া
গ) মুতাযিলা
ঘ) আশআরিয়া
ঙ) খারিজী
চ) মুরজিয়া
ছ) শিয়া মতবাদ।

জাবারিয়া মতবাদ

জাবারিয়া নামের উৎপত্তি আরবী 'জাবর' হতে। এর অর্থ বাধ্য করা, পূর্ব নির্ধারণ, অদৃষ্ট বা নিয়তি। আল্লাহ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী এবং মানুষের অলঙ্ঘনীয় অদৃষ্টের বিশ্বাস থেকেই এদের নামকরণ।

উমাইয়া শাসনামলে আবির্ভূত জাবারিয়া সম্প্রদায়ের চিন্তাবিদগণ মনে করতেন, আল্লাহ সকল বিষয়ের

উপর ক্ষমতাবান। মানুষের ইচ্ছা শক্তির কোন মূল্য নেই। তাদের ভাগ্যে যা ঘটবে তা পূর্ব নির্ধারিত। কাজেই তাদের কার্যাবলীর জন্য তারা আদৌ দায়ী নয়। কেননা সর্বশক্তিমান আল্লাহর ইচ্ছায় সে যন্ত্রের মত কাজ করে। মানুষের কাজ কর্মের পুরস্কার ও শাস্তি সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর সার্বভৌম শক্তির অধীন। তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেবেন এবং যাকে ইচ্ছা পুরস্কৃত করবেন। জাবারিয়া সম্প্রদায়ের চিন্তাবিদগণ আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও সর্বময় কর্তৃত্বের ক্ষমতার উপর গুরুত্ব প্রদান করতেন। তাদের মতবাদের সমর্থনে তারা পবিত্র কুরআনের নিম্নলিখিত আয়াতসমূহ উল্লেখ করেন;

فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

"আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দান করবেন। কেননা আল্লাহই সর্বসময় ক্ষমতার অধিকারী।" (২ : ২৮৪)

قُلِ ٱللَّهُمَّ مَالِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتِى ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَآءُ بِيَدِكَ ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

"বল, হে আল্লাহ! তুমিই সার্বভৌম শক্তির অধিকারী, তুমি যাকে ইচ্ছা রাজ্য দান কর এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজ্য ছিনিয়ে নাও এবং যাকে ইচ্ছা সম্মান দান কর, আর যাকে ইচ্ছা হীন কর। তোমার হাতেই রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ। নিশ্চয় তুমি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।" (৩ : ২৬)

জাবারিয়া সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন জাহম ইবন সাফওয়ান। তিনি ছিলেন খুরাসানের গভর্নর আল-হারিস বিন সুরয়িজের সচিব। তিরমিযে তিনি তার মতবাদ প্রথম প্রচার করেন। ৭৪৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি জনৈক সালাম বিন আহওয়ায আল-মাজিনী কর্তৃক নিহত হন। তার অনুসারীরা তিনটি প্রধান দলে বিভিক্ত ছিলেন-জাহরিয়া, নাজ্জারিয়া ও জাবারিয়া। এ উপদলগুলো ছোট খাট বিষয়ে ভিন্ন মত পোষন করলেও সবাই মানুষের অদৃষ্টে বিশ্বাসী ছিল।

জাবারিয়া সম্প্রদায়ের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন উমাইয়া শাসকবর্গ। উমাইয়া শাসকদের প্রায় সকলেই ছিলেন জাবারিয়া মতবাদে বিশ্বাসী।

জাবারিয়া সম্প্রদায়ের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন উমাইয়া শাসকবর্গ। উমাইয়া শাসকদের প্রায় সকলেই ছিলেন জাবারিয়া মতবাদে বিশ্বাসী। এ সুযোগে তারা নিজেদের অপকর্মকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য এ বলে বেড়াতেন যে, "পৃথিবীতে যা কিছু সংঘটিত হচ্ছে সবই আল্লাহর ইচ্ছায় হচ্ছে। সুতরাং এজন্য মানুষকে দায়ী করা যাবে না।" তাদের বিরুদ্ধবাদীদেরকে কঠোর রাজকীয় ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে স্তব্ধ করে দেওয়া হতো।

কাদারিয়া মতবাদ

কাদারিয়া শব্দটির উৎস 'কদর' যার অর্থ 'শক্তি' বা 'ক্ষমতা'। কাজেই কাদারিয়া মতাবলম্বী হলেন তারা যারা বিশ্বাস করেন যে, 'মানুষের কার্যক্ষমতা রয়েছে এবং তার সম্পাদিত কাজের জন্য সে নিজেই দায়ী। কাদারিয়া চিন্তাবিদগণ বিশ্বাস করেন, আল্লাহ সরাসরি কোন মানুষকে কার্য সম্পদান করতে বাধ্য করেন না। তিনি মানুষকে কার্যক্ষমতা প্রদান করেছেন। এ অর্থেই আল্লাহ সর্বশক্তিমান। সর্বশক্তির আধার হিসেবে আল্লাহ মানুষকে এমন কার্যের জন্য দায়ী করেন না, যার উপর মানুষের কোন ক্ষমতা নেই।

ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য উমাইয়া খলীফাগণ নিজেদের কর্মফল বা পরকালের শাস্তি বা পুরস্কারের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ না করে বরং সূক্ষ্মভাবে জাবারিয়াদের মতবাদ প্রচার করতে সাহায্য ও উৎসাহিত করতেন। ঐ সময় জাবারিয়াদের উক্ত মতবাদের বিরুদ্ধে কতিপয় চিন্তাবিদ মত প্রকাশ করেন, মানুষের বিচার-বুদ্ধি প্রসূত মুক্তচিন্তা ভাবনার স্বাধীনতা রয়েছে এবং স্বীয় কর্মের জন্য তাকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। যারা উক্ত মতে বিশ্বাসী ছিলেন তারাই মুসলিম দর্শনের ইতিহাসে কাদারিয়া নামে পরিচিত। কাজেই বলা যায়, জাবারিয়া মতবাদের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ কাদারিয়া মতবাদের উদ্ভব।

ঐতিহাসিকদের মতে, কাদারিয়া সম্প্রদায়ের মূল প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মা'বাদ আল-জুহানী (মৃ. ৬৯৯ খ্রি:)। তিনি ছিলেন ইমাম হাসান আল-বাসরীর শিষ্য। খলীফাগণ এ মতবাদকে বরদাশত করতে না পেরে এ মতবাদের প্রবক্তাদেরকে নির্মমভাবে নির্যাতন করেন। শেষ খলীফা আবদুল মালিক বিন মারওয়ানের নির্দেশে মা'বাদ আল-জুহানীকে দামেস্কে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। উমাইয়া শাসকদের

অমানুষিক অত্যাচার ও নির্যাতন সত্ত্বেও কাদারিয়া মতবাদের প্রদীপ শিখা নির্বাপিত হয়নি। বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে পরবর্তীতে মজবুতভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অবশেষে এ কাদারিয়া মতবাদই মুতাযিলা মতবাদ হিসেবে নতুনভাবে আবির্ভূত হয়।

মুতাযিলা মতবাদ

মুতাযিলাদের আবির্ভাব হয় চরমপন্থী খারেজীদের উগ্র মতবাদ এবং নরমপন্থী মুরজিয়াদের নমনীয় মতবাদের প্রতিক্রিয়া থেকে। ইমাম হাসান আল-বাসরীর (৬৪২-৭২৮ খ্রি:) শিষ্য ওয়াসিল ইবনে আতা (৬৯৯-৭৪৯ খ্রি:) ছিলেন এ মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা। বলা হয় যে, দামেশকের জামে মসজিদের এক মজলিসে হাসান আল-বাসরীকে একজন শিষ্য প্রশ্ন করেন, কবীরা গুনাহকারী কি মুমিন না কাফির? প্রতি উত্তরে তিনি বলেন, কবীরা গুনাহকারী ফাসিক মুমিন। শিষ্য ওয়াসিল ইবনে আতার নিকট উত্তরটি যথার্থ মনে না হওয়ায় তিনি বলে উঠলেন, আল-মানযিলু বাইনা মানযিলাতায়ন, অর্থাৎ কবীরা গুনাহকারী মুমিনও নয় কাফিরও নয়, বরং উভয় অবস্থার মধ্যস্থলে অবস্থিত। ওয়াসিল ইবনে আতা তখন তার সিদ্ধান্ত মসজিদের মিম্বারে উঠে বার বার প্রচার করছিলেন। তখন হাসান আল-বাসরী (র) বলে উঠলেন, ইতাযালা আন্নী, অর্থাৎ সে আমার দল পরিত্যাগ করেছে। এ থেকেই মুতাযিলা শব্দের উৎপত্তি এবং ওয়াসিল ইবনে আতার অনুসারীরা মুতাযিলা নামে পরিচিত হয়ে উঠে।

মুতাযিলা মতবাদের মূলনীতি

মুতাযিলা মতবাদ প্রধানত পাঁচটি মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। মূলনীতিগুলো নিম্নরূপ-

১. আত-তওহীদ
২. আল-আদল
৩. আল-ওয়াদু ওয়াল ওয়াঈদ
৪. আল-মানযিলাতু বাইনাল মানযিলাতায়ন
৫. আল-আমরু বিল-মারূফ ওয়ান-নাহী আনিল-মুনকার। নিম্নে এ মূলনীতিগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হল-

তাওহীদ বা একত্ববাদ

তাওহীদ বা একত্ববাদ হল আল্লাহ এক এবং অদ্বিতীয়। একমাত্র তাঁরই সত্তা চিরস্থায়ী। পৃথিবীতে আর কিছু চিরস্থায়ী নয়। অতএব তাঁর সিফাত বা গুণ নেই। যেহেতু আল্লাহ চিরস্থায়ী। সুতরাং তাঁর কোন সিফাত থাকলে তা অবশ্যই চিরস্থায়ী হতে হবে। আল্লাহর সাথে সিফাতের অস্তিত্ব মেনে নিলে আরও বহু চিরস্থায়ী সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করে নিতে হয়, যা নিরেট তাওহীদের পরিপন্থী। আল্লাহ জ্ঞানী, এ কথার অর্থ এই নয় যে, তাঁর সত্তা ব্যতীত জ্ঞান বলে পৃথক গুণ রয়েছে। বরং তাঁর যাত বা সত্তাই জ্ঞানী। অতএব সিফাত বা গুণাবলী বলতে যা বুঝায়, তা আল্লাহ তা'আলার যাত-এর মধ্যে নিহিত মহাশক্তিরই বিভিন্নমুখী বহিঃপ্রকাশ মাত্র। কেননা আল্লাহ বলেন-

سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ

"তিনি পবিত্র-মহিমান্বিত এবং তারা যা বলে, তিনি তার ঊর্ধ্বে।" (৬ : ১০০)

আল-আদল বা ন্যায়বিচার

মহান আল্লাহ ন্যায়বিচারক। তিনি অন্যায় অবিচার করতে পারেন না। মানুষকে ভাল কাজের জন্য পুরস্কৃত এবং মন্দ কাজের জন্য শাস্তি প্রদান করাও ন্যায়বিচারের দাবি। তা করা আল্লাহর কর্তব্য। কারণ মানুষ তার যাবতীয় কৃতকর্মের জন্য দায়ী হবেন। মানুষ নিজেই তার কর্মের কর্তা। কোন কাজ করার এবং না করার ব্যাপারে সে সম্পূর্ণ স্বাধীন। মানুষ যদি নিজের কর্মের কর্তা না হন, তার যদি কাজ করা এবং না করার স্বাধীনতা না থাকে এবং ভাল-মন্দ প্রত্যেকটি কাজ করার জন্য বাধ্য করা হয়, তবে তা ন্যায়বিচারের পরিপন্থী। সুতরাং মানুষ তার ইচ্ছা ও কর্মে সম্পূর্ণ স্বাধীন। তার কৃত ভাল-মন্দ যাবতীয় কাজের জন্য সে দায়ী থাকবে। এটাই ন্যায়বিচার। এ প্রসঙ্গে তারা আল কুরআনের আয়াতের উদ্ধৃতি উপস্থাপন করে

وَمَا رَبُّكَ بِظَلاَّمٍ لِّلْعَبِيدِ

"তোমার প্রতিপালক তাঁর বান্দাদের প্রতি অবিচার করেন না।" (সূরা হা-মীম আস-সাদজা : ৪৬)

আল-ওয়াদ ওয়াল-ওয়াঈদ বা পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি ও শাস্তির ভীতি

আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মাঝে যারা পুণ্যবান তাদের পুরস্কার এবং যারা পাপী তাদেরকে শাস্তি প্রদানের ওয়াদা করেছেন। তিনি কখনও তাঁর ওয়াদা খেলাপ করেন না। একাজ তাঁর কর্তব্য। কেননা পুন্যবানকে পুরস্কার না দেওয়া এবং পাপীকে শাস্তি না দেওয়া ন্যায়বিচারের পরিপন্থী। আল্লাহ বলেন-

إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ

"নিশ্চয় আল্লাহ ওয়াদা খেলাফ করেন না।" (সূরা আলে-ইমরান: ৯, সূরা রা'দ:৩১)

আল-মানজিলাতু বায়নাল মানযিলাতায়নঃ দুই অবস্থার মধ্যবর্তী অবস্থা

বিশ্বাস ও আমল এ দু'য়ের সমন্বয়ে হল ঈমান। বিশ্বাস এবং আমল হল ঈমানের দু'টি অঙ্গ। এদের যে কোন একটি ছাড়া ঈমান হতে পারে না। কোন বান্দা যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস রাখা অবস্থায় কোন কবীরা গুনাহ করে বসে, তাহলে সে আর মুমিন থাকে না। আবার কাফির ও হয়ে যায় না। ঈমান ও কুফুরির মধ্যবর্তী স্থলে অবস্থান করে। এমতাবস্থায় তার মৃত্যু হলে সে দোযখে যাবে। তবে তার শাস্তি কাফিরদের তুলনায় কিছুটা লঘু হবে। মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন-

أَفَمَن كَانَ مُؤْمِناً كَمَن كَانَ فَاسِقاً لاَّ يَسْتَوُونَ

"তবে যে ব্যক্তি মুমিন, সে কি পাপাচারীর ন্যায়? তারা সমান নয়।" (সূরা আস-সিজদা : ১৮)

নবী করীম (স.) বলেন-

لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن

"ব্যভিচারী মুমিন থাকা অবস্থায় ব্যভিচার করতে পারে না।" (মিশকাত)

আল-আমরু বিল-মারূফ ওয়ান-নাহী আনিল-মুনকার বা সৎ কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজের নিষেধঃ

কোন লোক কেবল নিজে মুমিন এবং পুণ্যবান হলেই তার দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। অন্যরাও যাতে ঈমানদার এবং পুণ্যবান হতে পারে সেজন্য সচেষ্ট হওয়াও তার জন্য একটি অপরিহার্য কর্তব্য। এ সম্পর্কে আল্লাহ ঘোষণা করেন-

وَلْتَكُنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ

"তোমাদের মাঝে এমন একদল লোক হোক যারা কল্যাণের দিকে আহবান করবে এবং সৎকাজের নির্দেশ দেবে ও অসৎ কাজে নিষেধ করবে।" (সূরা আলে-ইমরান : ১০৪)

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, "যদি একটি আয়াতও হয়, তাও তোমরা আমার নিকট হতে অপরের নিকট পৌঁছে দাও।" (মিশকাত)

আশআরিয়া মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা হলেন বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু মুসা আল -আশআরী (রা)-এর বংশধর ইমাম আবুল হাসান আল-আশআরী। তাঁরই নামানুসারে এ মতবাদ আশআরিয়া মতবাদ নামে পরিচিতি লাভ করে।

আশআরিয়া মতবাদ

আশআরিয়া মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা হলেন বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু মূসা আল-আশআরী (রা)-এর বংশধর ইমাম আবুল হাসান আল-আশআরী। তাঁরই নামানুসারে এ মতবাদ আশআরিয়া মতবাদ নামে পরিচিতি লাভ করে। জাবারিয়া এবং কাদারিয়াদের উত্তরসূরী মুতাযিলা মতবাদের মাঝামাঝি একটি মধ্যমপন্থী মতবাদ হিসেবে আশআরিয়া মতবাদ পরিচিত।

মুতাযিলাদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ছিল অনেক জটিল। সাধারণ জনগণের নিকট যা সহজ বোধ্য বলে মনে হয়নি। এ কারণে জনগণের বিভ্রান্ত হওয়ারও যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। তাই রক্ষণশীল আলিম সমাজ এ মতবাদকে ভাল চোখে দেখেননি। যার ফলে মুতাযিলা মতবাদের সমর্থক আব্বাসীয় খলীফা মামুন এই রক্ষণশীল আলিমগণের উপর নির্যাতন চালাতে শুরু করেন। এতে হিতে বিপরীত হয়। খলীফার এহেন

আচরণে জনগণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। এ সঙ্কট থেকে মুক্তি লাভের উদ্দেশ্য 'ইখওয়ানুস সাফা নামক একদল বিদগ্ধ পণ্ডিত ধর্মতত্ত্ব সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের উপর বণ্ড সংখ্যক মূল্যবান পুস্তক রচনা করেন ও ব্যাপক প্রচার কাজ চালান। মুসলিম সমাজের এ ক্রান্তিকালে ইমাম আশআরী তাঁর মধ্যমপন্থী মতবাদ নিয়ে জনগণের সম্মুখে উপস্থিত হন। আমরা জানি, আশআরী মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আবুল হাসান আলী বিন ইসমাঈল আল-আশআরী (৮৭৩-৯৩৫)।

একবার আল-আশআরী তাঁর শিক্ষক আল-জুবাইকে একটি সমস্যা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। একই পরিবারে তিন ভাই, প্রথম ভাই ঈমানদার ও চরিত্রবান, দ্বিতীয় ভাই বেঈমান ও চরিত্রহীন, তৃতীয় ভাই অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক। ঘটনাক্রমে তিন ভাইয়ের একত্রে মৃত্যু হল। আশআরী জানতে চাইলেন যে, উপরিউক্ত তিনজনের কার প্রতি আল্লাহ কিরূপ বিচার করবেন। ওস্তাদ জুবাই উত্তর দিলেন, ঈমানদার ভাই জান্নাতবাসী এবং বেঈমান ভাই জাহান্নামী, তৃতীয় নাবালক ভাই মধ্যবর্তী স্থান লাভ করবে এবং মুক্তি প্রাপ্তদের মধ্যে গণ্য হবে।' আশআরী বললেন, বালকটি যদি জান্নাতের দাবী করে তবে কি তাকে তা দেওয়া হবে? জুবাই বলেন, না। তাকে বলা হবে, তোমার ভাই ঈমান ও নেক আমলের দ্বারা এ মর্যাদা লাভ করেছে। তোমার ঈমান ও আমল কিছুই নেই, সুতরাং তুমি এ মর্যাদার আশা করতে পার না। আশআরী বললেন, তখন যদি বালকটি বলে, আমাকে তো ঈমান ও নেক আমল অর্জনের জন্য হায়াত দেওয়া হয়নি। জুবাই বললেন, তখন আল্লাহ বলেন, আমি জানতাম যে, তোমাকে হায়াত দান করলে তুমি বেঈমান হয়ে পাপের কাজ করবে। অতএব তোমার কল্যাণের জন্যই তোমাকে হায়াত দেওয়া হয়নি। আশআরী বললেন, তখন যদি বেঈমান ভাইটি বলে, হে আল্লাহ! আপনি আমার ছোট ভাইয়ের ভবিষ্যৎ যেমনি জানতেন, নিশ্চয় আমার ভবিষ্যৎ ও তেমনি জানতেন। তবে আমার কল্যাণের জন্য শৈশবকালে আমাকে মৃত্যুদান করলেন না কেন? জুবাই তখন হতবাক হয়ে গেলেন, এর কোন জবাব দিতে পারলেন না। এ ঘটনার পর থেকেই ইমাম আল-আশআরী মুতাযিলা মতবাদ পরিত্যাগ করে হাদীস ও কুরআন ভিত্তিক ধর্মীয় মতবাদ প্রচারে নিজে মনোনিবেশ করেন।

জাবারিয়া মতবাদে কর্ম ও ইচ্ছায় মানুষের কোন স্বাধীনতা নেই। আল্লাহ মানুষের কর্ম ও ইচ্ছা সৃষ্টি করে থাকেন। এ ব্যাপারে মুতাযিলাদের মতবাদ হল, কর্ম এবং ইচ্ছায় মানুষ সম্পূর্ণ স্বাধীন। মানুষ নিজেই তার যাবতীয় কাজের কর্তা বা স্রষ্টা। এ দুই মতের মধ্যবর্তী মত পোষণ করে আশআরিয়াগণ বলেন, 'বান্দার সকল কাজই আল্লাহ পাকের ইচ্ছা ও শক্তিতে সংঘটিত হয়। আল্লাহ বান্দাকে এ কাজ অর্জন বা বর্জন করার স্বাধীনতা দিয়েছেন। এ স্বাধীনতার জন্যই বান্দা তার কৃতকর্মের জন্য দায়ী হবে। অতএব আল্লাহ হলেন বান্দার কাজের সৃষ্টিকর্তা। আর বান্দা হলেন তার অর্জনকারী বা সম্পাদনকারী।

আশআরিয়াগণ আকায়িদ সংক্রান্ত সকল বিষয়ে চরম মতবাদ পরিহার করে মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন করেছেন, যা অপেক্ষাকৃত সহজ, সরল এবং যা জনগণের কাছে সহজবোধ্য। এ কারণে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অধিকাংশ লোক এ মতবাদ গ্রহণ করেছেন।

জাবারিয়া সম্প্রদায়ের একটি উপদল সিফাতিয়াদের মতে আল্লাহর সিফাত বা গুণাবলী বিদ্যমান। আল্লাহর এ গুণাবলী বা সিফাতসমূহ তাঁর যাত বা সত্তা বহির্ভূত পৃথক সত্তা এবং তা অবিনশ্বর। এ দলেরই চরম পন্থী মুশাববিহা গ্রুপ বলেন, আল্লাহর গুণাবলী মানুষের গুণাবলীরই অনুরূপ। অপরদিকে মুতাযিলাগণ বলেন, আল্লাহর কোন সিফাত বা গুণাবলীই নেই। সিফাত বলতে যা কিছু বুঝায় তা তাঁর যাতেরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। এ ব্যাপারে মধ্যপন্থী আশআরিয়া বলেন, আল্লাহর সিফাত রয়েছে। তবে এ সিফাতসমূহ তাঁর যাতও নয়, আবার যাতের বহির্ভূত পৃথক সত্তাও নয়। যেমন-সূর্যের রশ্মিমালা, এটা সূর্য নয়, আবার সূর্যের বহির্ভূত কোন পৃথক সত্তাও নয়।

মুতাযিলাদের মতে ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় এবং হালাল-হারাম নিরূপণের মানদণ্ড হচ্ছে মানুষের বিবেক বুদ্ধি। মানুষ তার এ বিবেক বুদ্ধির সাহায্যে কোনটা ভাল আর কোনটা মন্দ তা নির্ধারণ করতে সক্ষম। ওহী মানুষের বিবেক বুদ্ধিকে সমর্থন ও সহায়তা করে থাকে। পক্ষান্তরে আশআরিয়াগণের অভিমত হল ভাল-মন্দ এবং বৈধ-অবৈধ নির্ধারণের নির্ভুল মানদণ্ড হল ওহী বা ঐশী কালাম। তবে মানুষের সুস্থ বিবেক বুদ্ধি প্রায় ক্ষেত্রেই এর যৌক্তিকতা এবং যথার্থতা উপলব্ধি করতে পারে। আর একে সমর্থন করে থাকে। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, আশআরিয়াগণ ভাল-মন্দ নিরূপণের মাপকাঠি হিসেবে প্রাধান্য দিয়েছেন ওহীকে। আর মুতাযিলাগণ প্রাধান্য দিয়েছেন-আকল বা বিবেক বুদ্ধিকে।

মুতাযিলাদের অভিমত হল, আল্লাহ আদেল বা ন্যায়পরায়ণ। আল্লাহ কখনও অন্যায় করতে পারেন না। তাদের আরও অভিমত হল, ন্যায়নীতির দাবিতেই আল্লাহ পুণ্যবানকে পুরস্কার এবং পাপীকে শাস্তি দিতে বাধ্য। তিনি এর অন্যথা করতে পারেন না।

পক্ষান্তরে আশআরিয়াগণ বলেন, আল্লাহ সর্বশক্তিমান। তাঁর ক্ষমতা অসীম। কোন অবস্থাতেই বা কোন ব্যাপারেই তাঁর কুদরত সীমিত হওয়ার নয়। ইচ্ছা করলে পুণ্যবানকে পুরস্কার এবং পাপীকে শাস্তি দিতে পারেন। আবার ইচ্ছা করলে নাও দিতে পারেন। সবই তাঁর ইচ্ছা।

এ আলোচনা থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, আশআরিয়াগণ আকাইদ সংক্রান্ত সকল বিষয়ে চরম মতবাদ পরিহার করে মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন করেছেন যা অপেক্ষাকৃত সহজ সরল এবং যা জনগণের কাছে সহজে গ্রহণযোগ্য। এ কারণে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অধিকাংশ লোক এ মতবাদ গ্রহণ করেছেন।

সারসংক্ষেপ

রাসুলুল্লাহ (স.)-এর জীবদ্দশায় ইসলামের আকীদা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তেমন কোন সমস্যা দেখা দেয়নি। পরবর্তীকালে ইসলাম যখন বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে, তখন অন্যান্য জাতি ও ধর্মের লোকদের সংস্পর্শে আসে। ফলে ধর্ম বিশ্বাসের মৌলিক কোন কোন বিষয়ে সন্দেহ সংশয় সৃষ্টি হয়। তা ছাড়া মুসলিম পণ্ডিতগণ ধর্ম বিষয়ে নিজস্ব বুদ্ধি-বিবেচনায় ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেন। কেউ আবার নানা স্বার্থ সিদ্ধির জন্য উক্ত ব্যাখ্যায় নিজস্ব দৃষ্টভঙ্গির প্রতিফলন ঘটায়।

১. বিশেষত কর্ম ও ইচ্ছায় মানুষ স্বাধীন কিনা;
২. আল্লাহর সিফাত বা গুণাবলী আছে কিনা;
৩. ঈমান ও আমলের মাঝে সম্পর্ক;
৪. ন্যায় ও অন্যায়ের মাপকাঠি ওহী না মানুষের বিবেক;
৫. কুরআন চিরন্তন।

এসব বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টি-ভঙ্গি ও ব্যাখ্যার কারণে মুসলিম পণ্ডিত ও দার্শনিকদের মধ্যে ধর্মতাত্ত্বিক আকায়িদ সম্পর্কিত বেশ কয়েকটি মতবাদের সৃষ্টি হয়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য উপদলগুলো হল জাবারিয়া, কাদারিয়া, মুতাযিলা, খারিজী, মুরজিয়া, শিয়া এবং আশআরিয়া। এ মতবাদগুলোর মধ্যে আশআরিয়া মতবাদ মধ্যপন্থী ও সমন্বিত। বাকীগুলো চরমপন্থীদের। তাই এদের মধ্যে আশআরিয়া মতবাদকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতাবলম্বীগণ গ্রহণ করে থাকেন।

❑ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

➤ নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

▶ সঠিক উত্তরে টিক (√) চিহ্ন দিন-

১. ক'টি মূল বিষয়কে কেন্দ্র করে আকায়িদ সম্পর্কিত উপদলের সৃষ্টি হয়?
ক. ৫টি; খ. ১০টি;
গ. ৪টি; ঘ. ৩টি।

২. মানুষের ইচ্ছায় স্বাধীনতা নেই-এটা কোন মতবাদের লোকদের বিশ্বাস?
ক. কাদারিয়া; খ. জাবারিয়া;
গ. আশআরিয়া; ঘ. মুতাযিলা।

৩. জাবারিয়া মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা হলেন-
ক. মাওলানা আবদুল জাব্বার; খ. জাহম ইবনে সাফওয়ান;
গ. খুরাসানের গভর্নর আল-হারিস ইবনে সুরয়িজ;
ঘ. মাবাদ আল-জুহানী।

৪. জাবারিয়া মতবাদের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ কোন মতবাদ উদ্ভব হয়?
ক. মুতাযিলা; খ. আশআরিয়া;
গ. শিয়া; ঘ. কাদারিয়া।

৫. চরম খারিজীদের উগ্র মতবাদ ও নরমপন্থী মুরজিয়াদের নমনীয় মতবাদের প্রতিবাদে কোন মতবাদের উদ্ভব হয়-
ক. আশআরিয়া; খ. শিয়া;
গ. মুতাযিলা; ঘ. জাবারিয়া।

৬. মুতাযিলা মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন-
ক. মাবাদ আল-জুহানী; খ. আবদুল করীম শাহরাসতানী;
গ. আবুল হাসান আশআরী; ঘ. ওয়াসিল ইবনে আতা।

৭. আশআরিয়া মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম কে?
ক. ইমাম আবু হানীফা; খ. সাহাবী আবু মূসা আল-আশআরী;
গ. ইমাম আবুল হাসান আল-আশআরী; ঘ. ওয়াসিল ইবনে আতা।

৮. ভালমন্দ নিরূপণের মাপকাঠি হচ্ছে ওহী -এ মতবাদে বিশ্বাসী-
ক. আশআরিয়াগণ; খ. জাবারিয়াগণ;
গ. মুতাযিলাগণ; ঘ. কাদারিয়া।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. আকায়িদ সংক্রান্ত মতভেদের ক্ষেত্রসমূহ কী কী? লিখুন।
২. জাবারিয়া মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা কে? এ মতবাদের মূল বিষয়বস্তু লিখুন।
৩. কাদারিয়া মতবাদ কী ? বর্ণনা দিন।
৪. মুতাযিলা মতবাদের উৎপত্তির বিবরণ দিন।
৫. মুতাযিলা মতবাদের মূলনীতিগুলো উল্লেখ করুন।
৬. আশআরিয়া মতবাদের উৎপত্তির কারণ লিখুন।
৭. আশআরিয়া মতবাদের সাথে অন্যান্য মতবাদের তুলনা করুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. কী কী কারণে আকায়িদ সংক্রান্ত মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে? জাবারিয়া ও কাদারিয়া মতবাদ সম্পর্কে আলোচনা করুন।
২. মুতাযিলা ও আশআরিয়া মতবাদের পরিচয় দিন। মুতাযিলা মতবাদের মূলনীতিসমূহ আলোচনা করুন।

পাঠ-৪

আকায়িদ সম্পর্কিত মতবাদ : খারিজী, মুরজিয়া ও শিয়া

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- আকায়িদ সম্পর্কিত খারিজী মতবাদের বর্ণনা দিতে পারবেন;
- আকায়িদ সংক্রান্ত মুরজিয়া মতবাদের বিষয়বস্তু বলতে পারবেন;
- আকায়িদ সম্পর্কিত শিয়া মতবাদের বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

খারিজী মতবাদ

সিফফীন যুদ্ধের অবসান ঘটানোর জন্য হযরত আলী (রা)-এর পক্ষে আবু মূসা আল-আশআরী (রা) এবং মুয়াবিয়ার পক্ষে আমর ইবনুল আস (রা) সালিশ হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। আমর ইবনুল আস (রা)-এর বুদ্ধিতে মুয়াবিয়ার পক্ষে এবং হযরত আলীর বিপক্ষে যুদ্ধ বিরতির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। হযরত আলী ছিলেন শান্তি প্রিয়। তাই তিনি এ মীমাংসা নিঃসংকোচে মেনে নেন। হযরত আলী (রা)-এর পক্ষের একদল মুজাহিদ এ সিদ্ধান্তকে সহজভাবে মেনে নিতে না পেরে তারা ক্ষুব্ধ হয়ে দল থেকে বের হয়ে যায়। ইসলামের ইতিহাসে এরাই খারিজী বা দলত্যাগী সম্প্রদ্রায় হিসেবে পরিচিত।

খারিজীরা ঈমান ও আমলের ব্যাপারে একটি চরমপন্থী নতুন মতবাদ প্রচার করেন। তাদের মতে ঈমানের দু'টি রুকন। একটি অন্তরে বিশ্বাস, অপরটি হল আমল বা কাজে পরিণত করে দেখানো। অতএব অন্তরে বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ কোন ফরয আমল ত্যাগ করে সে মুমিন থাকতে পারে না। অবশ্যই সে কাফির হয়ে যাবে। তাদের অভিমত হল, জালিম ইমাম বা শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা প্রত্যেক মুমিনের জন্য ওয়াজিব। তাদের মতে জালিম ইমামের সমর্থনকারীও কাফির হয়ে যাবে। অতএব মুয়াবিয়ার (রা) বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ বন্ধের ফাতওয়া দান করেছে (আবু মূসা আল-আশআরী এবং আমর ইবনুল আস) তারাও কাফির।

এ চরমপন্থী খারিজীরা কোন ফরয আমল পরিত্যাগকারী অথবা কবীরা গুনাহকারীকে শুধু কাফির বলেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং তাদেরকে হত্যা করা মুমিনদের জন্য ওয়াজিব বলে ঘোষণা করেছে।

মুরজিয়া মতবাদ

মুরজিয়া নামটি আরবি 'ইরজা' শব্দ হতে এসেছে। এর অর্থ স্থগিত রাখা, আশাবাদী হওয়া, পেছনে রাখা। মুরজিয়া সম্প্রদায় বলতে তাদেরকে বুঝায়, যারা শেষ বিচারের দিন আল্লাহ কর্তৃক কেউ দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত নিজেদের রায় দিতে স্থগিত বা বিরত থাকে বা আশাবাদী থাকে। তারা আমলকে গুরুত্ব দেয় না এবং আমলের প্রয়োজন মনে করে না। মুরজিয়াদের বক্তব্য ছিল নিম্নরূপঃ

১. মুসলমান মাত্রই ইসলামী সমাজের অন্তর্ভুক্ত। আমলে ত্রুটি দেখা দিলেও তার ঈমান ত্রুটিপূর্ণ হয় না বরং পরিপূর্ণ থাকে।

২. খিলাফতের প্রশ্নটি আল্লাহর ইচ্ছার উপর দেওয়া উচিত।

৩. বাহ্যত যাকে অপরাধী বা পাপী বলে মনে হয়, তার মধ্যে যদি ঈমান থাকে, তবে তাকে অপরাধী বা পাপী বলা যাবে না।

৪. যার ঈমান আছে এবং নিয়াত বা উদ্দেশ্য ভাল সে পুরস্কৃত হবে, যদিও তার আমলে ত্রুটি থাকে।

৫. কেউ যদি কাফির হয় আমল দ্বারা তার কোন লাভ হবে না, আর যদি মুমিন হয়, তাহলে পাপ তার

কোন ক্ষতি করবে না। পাপী মুমিনকে কাফির বলা উচিত নয়।

৬. প্রথম চার খলীফার প্রত্যেকেই সমভাবে উত্তম ছিলেন।

মুরজিয়াদের অধিকাংশের মতে শুধু অন্তরে বিশ্বাস করার নাম ঈমান। মুখে স্বীকার করা এবং আমল করা আসলে ঈমানের জন্য জরুরি নয়। তাদের কিছু সংখ্যকের মতে অন্তরে বিশ্বাস করলে চলবে না বরং বিশ্বাসের সাথে সাথে মুখেও স্বীকার করতে হবে। তবে এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে, আমল ঈমানের রুকন বা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ নয়। অতএব মুমিন হতে হলে আমল শর্ত নয়। বরং অন্তরে বিশ্বাস রেখে মুখে স্বীকার করাই যথেষ্ট। সুতরাং যদি কেউ অন্তরে বিশ্বাস রেখে নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদি আমলগুলোও পরিত্যাগ করে এবং কবিরা গুনাহ যদি করে থাকে, তবুও সে মুমিন থাকবে, কাফির হবে না। যুক্তি স্বরূপ তারা বলেন, পবিত্র কুরআন শরীফ আরবি ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং আরবি অভিধানে ঈমান শব্দের অর্থ হল অন্তরে বিশ্বাস করা। এছাড়া কুরআন মাজীদে বর্ণিত আছে যে, হযরত ইউসুফ (আ)এর ভ্রাতাগণ তাদের পিতা হযরত ইয়াকুব (আ)-কে বলেছিলেন,

মুরজিয়াদের অধিকাংশের মতে শুধু অন্তরে বিশ্বাস করার নাম ঈমান। মুখে স্বীকার করা এবং আমল করা আসলে ঈমানের জন্য জরুরি নয়। তাদের কিছু সংখ্যকের মতে, অন্তরে বিশ্বাস করলে চলবে না বরং বিশ্বাসের সাথে সাথে মুখেও স্বীকার করতে হবে। তবে এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে, আমল ঈমানের রুকন বা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ নয়।

وَمَآ أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا

"কিন্তু তুমি তো আমাদের বিশ্বাস করবে না।" (সূরা ইউসুফ : ১৭)

এখানে অন্তরে বিশ্বাসের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর মহানবী (স.) বলেন যে,

الايمان ان تؤمن بالله وملئكته و كتبه ورسله

অর্থাৎ "আল্লাহ, ফেরেশ্তামণ্ডলী, কিতাবসমূহ এবং রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস করার নামই ঈমান।" এখানে ঈমান কথা দ্বারা অন্তরের বিশ্বাসকেই বুঝানো হয়েছে।

এ আলোচনায় দেখা যায়, খারিজীদের সম্পূর্ণ বিপরীত মতাদর্শ নিয়ে মুরজিয়াদের আবির্ভাব হয়েছিল। খারিজীগণ যে ক্ষেত্রে ফরয কাজ বর্জনকারী এবং কবীরা গুনাহকারীকে সরাসরি কাফির হিসেবে আখ্যায়িত করছেন, মুরজিয়াগণ সেখানে তাকে মুমিন হিসেবে স্বীকৃতি দান করেছেন। মুরজিয়ারা অত্যন্ত উদার নীতি অবলম্বন করেন। তারা বলেন, কোন ব্যক্তি অন্তরে বিশ্বাস রেখে ফরয কাজসমূহ পরিত্যাগ করলে এমনকি কবীরা গুনাহসমূহ করলেও মুমিনই থেকে যাবে, কাফির হবে না। এ শ্রেণীর অপরাধীর বিচারের ভার আল্লাহর উপরই ন্যস্ত থাকবে। এ ব্যাপারে আমাদের কোন বক্তব্য নেই।

শিয়া মতবাদ

শিয়া অর্থ দল যা 'শিয়াতু আলী' কথাটির সংক্ষিপ্ত রূপ। 'শিয়াতু আলী যার অর্থ আলীর দল। অতএব হযরত আলী (রা) এবং তাঁর বংশধরদের সমর্থনকারী দলের নামেই এ দলের নামকরণ করা হয়েছে। শিয়াদের অভিমত হল, রাসূলুল্লাহ (স.)-এর ইন্তিকালের পর খিলাফত লাভের জন্য সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত ব্যক্তি হলেন হযরত আলী ও তাঁর বংশধরগণ। যেহেতু রক্ত সম্পর্কের দিক থেকে হযরত আলী রাসূলুল্লাহ (স.)-এর নিকটতম আত্মীয়-চাচাতো ভাই ও জামাতা। ছোট অবস্থা থেকে তিনি রাসুলের ঘরে লালিত পালিত হন। কনিষ্ঠদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ (স.) একবার বলেছিলেন:

أنا مدينة العلم وعلى بابها

"আমি হলাম জ্ঞানের নগরী আর আলী এর দ্বার।"

সুতরাং তিনিই রাসূলের ন্যায়সঙ্গত উত্তরাধিকারী এবং খিলাফতের একমাত্র প্রাপ্য তিনি। তারই বংশধরদের মধ্য হতে ইমাম নিয়োগ হবে, অন্য বংশের লোক ইমাম হতে পারে না। এটাই হল শিয়া মতবাদের সর্বপ্রধান মূলনীতি। তাদের মতে হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উমর (রা.) ও হযরত উসমান (রা.) এঁরা সবাই হযরত আলীকে তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে নিজেরা খলীফা হয়েছিলেন। পরবর্তী পর্যায়ে উমাইয়া ও আব্বাসীয় খলীফাগণও একই কায়দায় সিংহাসন দখল করে হযরত আলীর বংশধরদের বঞ্চিত করেছেন। শিয়াগণ হযরত আলীর প্রতি এত বেশি ভক্তি প্রদর্শন করত, যার কারণে কালেমা তাইয়্যেবা لا إله إلا الله محمد رسول الله এর সাথে على خليفة الله কথাটি সংযোজন করে থাকে।

শিয়া মতানুসারে যিনি ইমাম হবেন তিনি ঐশী আলোকপ্রাপ্ত এবং আধ্যাত্মিক শক্তিতে শক্তিশালী হবেন। যেমন- রাসুলুল্লাহ (স.) আল্লাহর পক্ষ থেকে সরাসরি ঐশী আলোক এবং অধ্যাত্মিক শক্তি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। দলীল হিসেবে পবিত্র কুরআনের এ আয়াতটি পেশ করেন:

وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ

"এবং যাকে মানুষের মধ্যে চলবার জন্য আলোক দিয়েছি।" (সূরা আল-আনআম : ১২২)

তারা আরও বলেন, আল্লাহ মানুষকে এ নূরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার জন্য নির্দেশ দিয়ে বলেন-

فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا.

"অতএব তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও যে জ্যোতি আমি নাযিল করেছি তাতে বিশ্বাস স্থাপন করো।" (সূরা আত-তাগাবুন : ৮)

শিয়াদের মত হল, রাসূলুল্লাহ (স.)-এর নিকট থেকে হযরত আলী (রা.) উত্তরাধিকার সূত্রে এ নূর বা আলো প্রাপ্ত হন এবং বংশ পরম্পরায় হযরত আলীর বংশধরগণ এ আলো লাভ করে আসছেন ও ইমাম হয়ে আসছেন। এ বংশের সর্বশেষ ইমাম লোক চক্ষুর অন্তরালে আত্মগোপন করে রয়েছেন। তিনি এখনও জীবিত আছেন। পৃথিবীর যখন পাপ পঙ্কিলতায় সম্পূর্ণ নিমজ্জিত হয়ে পড়বে, তখন তিনি আত্মপ্রকাশ করবেন মানুষকে হিদায়াতের জন্য। তবে এ আত্মগোপনকারী ইমাম কোন জন এ নিয়ে শিয়াদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। তারা দু'দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন, যা ইসনা আশারিয়া ও সাবইয়া নামে পরিচিত।

আরবি ইসনা আশারা অর্থ হল বার, অতএব শিয়াদের মধ্যে যারা বার ইমামে বিশ্বাসী তারাই ইসনা আশারিয়া নামে পরিচিত।

আবার আরবি 'সাবউন' শব্দের অর্থ সাত, শিয়াদের মধ্যে যারা সাত ইমামে বিশ্বাসী তারাই সাবইয়া নামে অভিহিত। সাবাইয়ারা ইসমাঈলিয়া নামেও পরিচিত।

সারসংক্ষেপ

আকায়িদ সম্পর্কিত মতবাদের মধ্যে খারিজী, মুরজিয়া ও শিয়া সম্প্রদায় অন্যতম। এ তিনটি মতবাদই চরমপন্থী। সিফফীন যুদ্ধের অবসান ঘটানোর সময় সালিশীকে কেন্দ্র করে মুয়াবিয়ার বিরোধী হযরত আলী (রা)-এর পক্ষাবলম্বী কিছু চরমপন্থী সালিশীকে অন্যায় রায় ঘোষণা করে এবং তারা তা মেনে নিতে পারেনি। ফলে তারা হযরত আলী (রা)-এর দল ত্যাগ করে চলে যায়। এরাই ইতিহাসে খারিজী নামে পরিচিত।

মুরজিয়া মতাবলম্বীগণ নরমপন্থী এবং আল্লাহর রহমতের আশাবাদী। এরা মনে করে, অন্তরে বিশ্বাস করার নামই ঈমান। মুখে স্বীকার ও আমল করা আসল ঈমানের জন্য জরুরী নয়।

শিয়াগণ হযরত আলী এবং তাঁর বংশধরদের সমর্থনকারী। এদের মূল বিশ্বাস হচ্ছে, খিলাফতের অধিকার কেবল হযরত আলী ও তাঁর বংশধরগণের রয়েছে। প্রথম তিন খলীফাকে তারা বৈধ খলীফা বলে মেনে নিতে চান না। এদের মধ্যে নানা উপদল রয়েছে। সে সবের মধ্যে বার ইমামে বিশ্বাসী ইসনা আশারিয়া ও সাত ইমামে বিশ্বাসী সাবইয়াগণ প্রধান। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের বিশ্বাসের সাথে এ সব মতবাদের অমিল রয়েছে। এদেরকে ভ্রান্ত মতাবলম্বী মনে করা হয়।

❑ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

➤ নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

▶ সঠিক উত্তরে টিক (√) চিহ্ন দিন-

১. কোন যুদ্ধের অবসান ঘটানোর সালিশীকে কেন্দ্র করে খারিজী মতবাদের উৎপত্তি হয়?
ক. সিফফীন যুদ্ধ; খ. বদর যুদ্ধ;
গ. উষ্ট্রের যুদ্ধ; ঘ. খন্দকের যুদ্ধ।

২. খারিজীদের মতে ঈমানের দু'টি রুকন-একটি অন্তরে বিশ্বাস অপরটি হলো-
ক. মুখে স্বীকার করা; খ. আমল বা কাজে পরিণত করে দেখানো;
গ. জিহাদে অংশ গ্রহণ; ঘ. আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি আনুগত্য।

৩. খারিজীদের মতে জালিম ইমাম বা শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা প্রত্যেক মুমিনের উপর-
ক. ফরয; খ. নফল;
গ. ওয়াজিব; ঘ. সুন্নাতে মুয়াক্কাদা।

৪. মুরজিয়াদের মতে শুধু-
ক. অন্তরে বিশ্বাসের নাম ঈমান;
খ. মুখে স্বীকার করার নাম ঈমান;
গ. আমল বা কাজে পরিণত করার নাম ঈমান;
ঘ. সব ক'টি উত্তরই সঠিক;

৫. মুরজিয়াগণ বলেন, ফরয বর্জনকারী এবং কবীরা গুনাহকারী-
ক. মুনাফিক নয়; খ. কাফির নয়;
গ. ফাসিক নয়; ঘ. মুমিন নয়।

৬. শিয়াতু আলী কথার অর্থ-
ক. আলীর দল; খ. আলী বিরোধী;
গ. আলীর শত্রু; ঘ. আলীর বন্ধু।

৭. শিয়াদের মতে খিলাফতের একমাত্র প্রাপ্য কারা?
ক. সাহাবীগণ; খ. প্রথম তিন খলীফা;
গ. উমাইয়া বংশ; ঘ. হযরত আলী ও তাঁর বংশধর।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. খারিজী মতবাদের মূলকথা লিখুন।
২. মুরজিয়া কারা? তাদের মূল বিশ্বাসগুলো কী কী? লিখুন।
৩. শিয়া বলতে কী বুঝায়? শিয়াদের প্রধান মূলনীতি কী? বর্ণনা করুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. খারিজী, মুরজিয়া ও শিয়া বলতে কী বুঝেন? তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস আলোচনা করুন।

নোট করুন